শিক্ষা লভিয়া জাগো কল্যাণকাজে

প্রব্রাজিকা শিবলোকপ্রাণা

পরাধীন ভারতের পথে পথে পরিব্রাজনে বেরিয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিপীড়িত, দুর্বল জনসাধারণকে দুঃখ-যন্ত্রণায় মানসিকভাবে ক্লান্ত, অবসন্ন দেখে নরঋষি নরেন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়ে লিখেছিলেন : ''সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না।'' তাই আহ্বান করলেন সেই সাহসী, হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ প্রেমিকদের—''জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।...

''জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। .জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।''

লন্ডনে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন মার্গারেটের মধ্যে আছে সেই জ্বলন্ত প্রেম, আছে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের ক্ষমতা। তাই লিখলেন, ''তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?'' নিজের অখণ্ড বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন : ''এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে।... তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।''

একইসঙ্গে ভারতের শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই জানিয়ে স্বামীজী লিখলেন : ''হৃদয়—শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যায়। সুতরাং বর্তমান পরিকল্পনা এই যে, বহু যুবককে গড়ে তুলতে হবে...।''

এই কঠিন কাজের সব দিকের কথা মার্গারেটকে ছবির মতো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর যখন স্বামীজী বুঝেছেন দেবতার পায়ে নিবেদনের যোগ্য হয়ে উঠেছে অর্ঘ্যটি, তখনই প্রাণঢালা আশীর্বাদবর্ষণ : ''আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো।... ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-

উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।"

উদ্দীপ্ত, ব্যগ্র, উৎসাহী, অদম্য মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—আইরিশ রক্তের জন্য উদার, আবেগময়। কেল্টিক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলি—বাক্‌পটুতা এবং প্রভাব বিস্তারের সম্মোহনী শক্তি তাঁর বৈশিষ্ট্য। স্বামীজীর কণ্ঠ তাঁর হৃদয়ে অনুরণন তুলল—ভারতবর্ষকে জানো, ভারতবর্ষকে ভালবাসো। সেই বীজমন্ত্র আত্মস্থ করে ভারতবর্ষের মুক্তদিনের আলোকলাভের তপস্যায় বিবেকানন্দ-চরণে নিজেকে উৎসর্গ করলেন তিনি—হয়ে উঠলেন স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সংগ্রাম করলেন, সর্বস্ব দান করলেন।

স্বামীজী তাঁকে প্রধানত নারীশিক্ষাকাজের জন্য ভারতে আহ্বান করেছিলেন। রক্ষণশীল বাগবাজারের একটি গলিতে অনেক কষ্টে কয়েকটি মেয়েকে জুটিয়ে নিবেদিতা যখন তাঁর শিক্ষাদানের কাজ শুরু করলেন, তখন তাঁর শিক্ষাভাবনা তাদের উপর ঢেলে দিলেন। ভারতে আসার আগেই তিনি বিদগ্ধ শিক্ষাতাত্ত্বিক, সেইসঙ্গে শিক্ষাব্রতী। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতার সঙ্গে নিবেদিতা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়ে স্পন্দিত হত ভারতবর্ষের আদর্শ। তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারতকন্যা হয়ে ভারতের মেয়েদের শিখিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের হৃতগৌরব কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে, কীভাবে ভালবাসতে হবে দেশজননীকে। দেশের প্রতি ভালবাসা তখনই আসবে যখন, পরিবার পরিজন, আত্মীয়-বন্ধু, প্রতিবেশীদের উপর, মায় যে ভিক্ষুকবৈরাগীটি গান গেয়ে ভিক্ষা করছে তার জন্যও হৃদয় কাতর হবে।

নিবেদিতার অন্তরের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল ছোট ছোট প্রাণগুলি। ভারতবর্ষের মানচিত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন এই বোধ—মাটি, জল, বাতাস, গাছপালা, পাহাড়, নদী সবকিছু নিয়েই ভারতবর্ষ দেবভূমি—এঁকে রক্ষার দায়িত্ব ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদেরই। রানি পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাঈ, অহল্যাবাঈ প্রমুখ স্বনামধন্যা ভারতীয় নারীদের কাহিনি শোনাতেন তিনি। তাঁর প্রাণের স্পর্শে যেন জেগে উঠত এসব চরিত্র।

স্বামীজী লিখেছিলেন : ''মার্গট, তুমি যা-কিছু দিতে চাও, দাও—A.B.C. শেখানো নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এর মূল্য সামান্য। ছাত্রীদের যতটা ইচ্ছা—রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, শিব এবং কালী, শিক্ষা দিতে চাও, দাও।... তুমি খোলাখুলি বলো, ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যা তুমি দিতে চাও।"[১] নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন, ইংরেজি লিখতে-পড়তে পারাই শিক্ষা নয়—মানুষ হওয়ার শিক্ষালাভ করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ করতে গিয়ে নম্রতা, কমনীয়তা, পবিত্রতা ইত্যাদি নষ্ট হলে তা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। সুতরাং ভারতীয় নারীদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন, যার লক্ষ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ বিকাশ। তাই তিনি তাঁর স্কুলে পল্লির মহিলা ও ছাত্রীদের জন্য যোগীন মা এবং স্বামী সারদানন্দজীকে দিয়ে গীতার ক্লাস করানোর এবং মাঝে মাঝে পুরাণাদি কথকতা শোনানোর ব্যবস্থা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষার সাহায্যে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, একবার তিনি নিবেদিতাকে তাঁর কন্যার শিক্ষাভার গ্রহণের অনুরোধ করেন। নিবেদিতা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন : ''বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভেতর যে জিনিসটা আছে, তাকে জাগিয়ে তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষা দিয়ে সেটাকে চাপা দেওয়া আমার

কাছে ভাল মনে হয় না।"[২]

কোন সুদূর গ্রামের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আঙুরের গুচ্ছে মিষ্টি রস সঞ্চার করার সময় দিয়েও, সূর্যদেব সমস্ত সৌরমণ্ডলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। নিবেদিতা লোকমাতা! তাঁর মাতৃভাব তাঁর পরিবারের বাইরের একটি গোটা দেশের উপরে তাঁকে ছড়িয়ে দিয়েছিল—কেবলমাত্র একটি স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে।

বাগবাজারের এক সংকীর্ণ গলিতে যে-শিক্ষাপ্রচেষ্টার সূত্রপাত তা বিস্তৃত হল বৃহত্তর দেশে। অজস্র মানুষ আসতেন তাঁর কাছে—ছোটবড়, বিখ্যাত কিংবা অখ্যাত—সবাই কিছু না কিছু শিক্ষা নিয়ে যেতেন। কিন্তু নিবেদিতার বিশেষ ঝোঁক তরুণদের শিক্ষাদানে—তারাই যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ! পরবর্তী কালে জ্ঞানী-গুণী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন এমন অনেকেই তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েছেন। বিবেকানন্দ সোসাইটি, ডন সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি তরুণদের কাছে যেতেন, তারাও যথেচ্ছ তাঁর ছোট্ট বাড়িটিতে আসত। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করে নিবেদিতা বলেছিলেন : ''বিদেশীর কাছে আপনার পতাকা কখনো নিচু করবেন না। যে বিশেষ বিভাগ আপনি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, তাতে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষ যেন এ বিষয়ে প্রথম বলে স্বীকৃতি লাভ করে।"[৩] দীর্ঘকালের কর্মক্ষেত্রে স্যার যদুনাথ একথাটি কখনও ভোলেননি।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ জীবন ও চিন্তায় গ্রহণ করে ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রার্থনা করেছেন, ঈশ্বর তাঁকে শক্তি দিন, যাতে তিনি স্বামীজীর নামে সাহসদীপ্ত সত্যবাণী উচ্চারণ করতে পারেন। সেই বাণীতে যেন প্রবাহিত হয় স্বামীজীর অবিকৃত অব্যাহত জীবন। সমাজবিজ্ঞানী বিনয়কুমার সরকার, অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য বহু মানুষই তাঁর কাছে প্রেরণা লাভ করেছেন।

তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে নিবেদিতা যখন গীতা ব্যাখ্যা করেছেন অথবা স্বামীজীর বাণী প্রচার করেছেন তখন তাঁর মধ্য দিয়েই তারা ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেছে—পরাধীন দুর্বল জাতির অসহায় বেদনা তাদের মর্মে আঘাত করেছে, বীরত্ব ও পৌরুষে ভরে উঠেছে তাদের অন্তর। নিবেদিতার সংস্কৃতি বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ইংরেজি রচনার কৌশলে বহু ছাত্র আকৃষ্ট হয়েছে এবং উচ্চ জীবনযাপনে প্রেরণা পেয়েছে। ছাত্রদের যে তিনি কেবল ভালবেসেছেন তা-ই নয়—ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিরা জীবনযাত্রায় যে-কর্মক্ষেত্রই বেছে নিক, উচ্চ আদর্শ, আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বদেশনিষ্ঠা যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়—এই ছিল নিবেদিতার আন্তরিক ইচ্ছা।

নিবেদিতার গভীর পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের উপর অকপট ভালবাসা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত বিনয় সরকার লিখেছেন : ''নিবেদিতা তুখোড় মেয়ে। মগজ্‌টা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাব-নিষ্ঠা, রোমাণ্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায় [পায়ে]। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার মতন সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক

ভারতীয় স্বদেশসেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশ-ধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন...। কোনো বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নরনারীর জীবন-কথা এত গভীরভাবে বুঝ্তে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর এই বিশ্লেষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়্ত। এই সবের ভেতরকার ভারতীয় দরদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"[৪]

মনস্বী বিপ্লবী তারকনাথ দাস কিংবা শিল্পতাত্ত্বিক অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও নিবেদিতার কাছে যে সাহায্য ও প্রেরণা পেয়েছেন—তা অকপটে স্বীকার করেছেন। শিল্পী নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন—তাঁদের সাফল্য অর্জনের মূলে ছিলেন নিবেদিতা। তিনিই উদ্যোগী হয়ে নন্দলাল বসু এবং অসিতকুমার হালদারকে অজন্তায় পাঠিয়েছেন, নানাভাবে ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে জ্ঞানঅর্জনে সাহায্য করেছেন। শিল্পী অসিতকুমার লিখেছেন : ''আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা-কাল। ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজার যেতাম। আমাদের উপদেশছলে বারবার সাবধান করতেন, আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।... আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে।..."[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, স্বামীজী জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন ছিলেন। বিবেকানন্দ ধর্মাচার্য হলেও স্বজাতির ঐহিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বিবেকানন্দের চোখের সামনে যে-ভারতবর্ষ ছিল, তা অধ্যাত্মসেবক ও জনসেবক, কর্মী ও বৈজ্ঞানিকের দেশ। স্বামীজী জানতেন, ভারতের পতনের মূলে রয়েছে ঐহিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা। ঐহিক জ্ঞানে ঘাটতি থাকলে জাতীয় জীবনে সমতা আসবে না কখনও। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞানের মতোই সত্যসন্ধানী, কখনই ধর্মবিরোধী নয়। ধর্মের মূলসত্য বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত সত্যরূপে গৃহীত হবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জগদীশচন্দ্র বসুর প্রশংসায় স্বামীজী কখনও ক্লান্ত হতেন না, কারণ তাঁর মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেছে এই বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব প্রতিভা।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বামীজীর পতাকা নিয়ে নিবেদিতা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতবর্ষের উপরে। বিবেকানন্দের মধ্যে যে-গতিশীল সংস্কারমুক্ত জাতীয়তা দেখেছেন—তাকেই ছড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি। লিখলেন : আমি চাই, তাঁর দায় বহন করতে। আমি চাই বিরাট একটা সেবা করতে, অন্তত পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ। আগুনের ঝড় তুললেন বক্তৃতায় বক্তৃতায়। ১৫ জানুয়ারি, ১৮৯৭ ভারতবর্ষে পা দিয়ে কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত এবং তার পরেও স্বামীজী যে-সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছেন, নিবেদিতার মনে হয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্য নিছক ধর্মপ্রচার নয়—তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সবার মধ্যে মানুষ হওয়ার প্রেরণা জেগে উঠেছিল। মানুষ তৈরি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই প্রবল প্রেরণা জাগিয়ে রাখার দায় এবং এক প্রবল উদ্দীপনা নিবেদিতা সবসময় নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। স্বামীজীর বাণী ভারতের সর্বত্র ঘোষণা করতে হবে—প্রচার করতে হবে তাঁর মহৎ আদর্শ—তবেই এ-জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচবে, তখনই ভারতের মহিমা পৃথিবীতে আবার ঘোষিত হবে, মানুষ উচ্চতম জীবনের সন্ধান পাবে।

বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের সামনে নিবেদিতার অগ্নিঝলকের মতো একটি ভাষণ এবং তার শেষে আশ্চর্য এক উচ্চারণ—আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন পালের কাছে মনে হয়েছিল ভবিষ্যতের ভেরিধ্বনি। একটি তরুণের মনোজগতে নিবেদিতার আচরণ কী অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহু বছর পর লেখা স্মৃতিকাহিনি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রমথরঞ্জন লিখেছেন : ''১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরের এক রবিবার, বেলা তখন প্রায় একটা, ছুটির দিন... হঠাৎ ভগিনী উপস্থিত। আমরা তাঁকে দেখে সবাই খুশি। ... আমরা অনেকদিন কেন তাঁর কাছে যাই নাই জিজ্ঞাসা করলেন এবং ঐদিন তাঁর আবাসে বিকালে যাবার জন্য বলে গেলেন। আমরা ৬-৭ জন বন্ধু মিলে তাঁর ওখানে বেলা ৪.৩০ নাগাদ গেলে তিনি আমাদের রসনা প্রথম [বাগবাজারের] নবীন [ময়রার] রসগোল্লায় তৃপ্ত করলেন। ...তারপর উপরে তাঁর বসার ঘরে সবাই কম্বলের উপর উপবেশন করলে তিনিও আমাদের পাশে বসলেন। প্রথমে আমাদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, অভাব, অসুবিধা ইত্যাদি খুঁটিনাটির খবর নিলেন। ...ধর্ম উপদেশের প্রসঙ্গ উঠলে ভগিনী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : What do you mean by DHARMA? আমরা পাঁচ-ছয়জন একে-একে উত্তর দিই।... ভগিনী বললেন : I have heard you all most patiently and I am much pleased with your views and versions and appreciate these highly. ...True! that which you all have just said, is what SANATANA DHARMA teaches or senses.

But my dear young boys, besides all your conception or knowledge of DHARMA I shall now tell you something of a higher, nobler and more sacred factor in your lives which I would urge most honestly and emphatically to you all to follow or act as your sublimest and greatest DUTY, the first and foremost obligation.

You all are required first to know your Motherland–your great MOTHER!

MOTHER BHARATBARSHA!

You must not discriminate, distinguish, or differentiate between them--Mother Country or Mother.

I would advise you to see Her, go round Her, to know Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word their history thoroughly, to meet them and mix with them intimately often, whenever such an opportunity occurs to love them. Just as a son or a daughter behaves or mixes with his or her mother freely and intimately, so you should love Her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutations!

BANDE MATARAM!

''বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করলেন সুস্পষ্ট সংস্কৃতে।

''বলার পর ভগিনী নীরব রইলেন।

''শুধু আমি নয়, অন্য সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে ঐ সময়ে লক্ষ্য করেছি; যতক্ষণ তিনি মাতৃভূমি ভারতমাতার সম্বন্ধে বলছিলেন তাঁর মুখমণ্ডল এক অনির্বচনীয় দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।

''কিছু পরে তিনি বললেন,

"Go back to your Boarding, your homes, think, ponder seriously and medi-

tate over this most sublime mantram and sacred subject and the word-BANDE MATARAM.

''...সেদিন ঐ বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন...সেদিন ঐ 'বন্দেমাতরম্' ছিল তাঁর শেষ বাণী। আমাদের সকলের মনে কি-যেন-এক পরম পবিত্র ভাবের উদয় হল। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি একটিবারও ভারত সম্বন্ধে 'It' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, সর্বদাই বলেছেন 'Her'—এবং আমাদের সেইভাবে নিতে বলেছিলেন।...

''ফেরবার সময়ে আমরা পরস্পর কোনো আলোচনা না করে শুধু ঐ দৃশ্য বা ঘটনার চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। তাঁর উদাত্ত উক্তির মধ্য দিয়ে কি গুরুগতপ্রাণা ব্রহ্মবাদিনী ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই শোনাননি, গুরুর আত্মাই প্রিয় শিষ্যার দেহাবলম্বনে দেশমাতৃকার সেবার শিক্ষাদান করেননি?...

''...বোর্ডিং-এ ফিরে হাত-পা-মুখ ধুয়ে যে যার কামরায় গেলাম। আমার কেবলই মনে পড়ছিল ভগিনীর তেজোদৃপ্ত বাণী—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। বন্দেমাতরম্।...

''পরদিন অপরাহ্ণে কলেজ থেকে ফিরে আমরা জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় একজন তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল যে, ভগিনী নিবেদিতার গাড়ি ফটকের সামনে উপস্থিত। সাধারণতঃ তিনি সেকেন্ড ক্লাস বন্ধ গাড়িতে আসতেন, তাতে রাস্তায় লোহার চাকার ঘর্ষণধ্বনি শুনে আমরা বুঝতে পারতাম, তিনি এসেছেন। কিন্তু সেদিন এলেন ফার্স্ট ক্লাস ফিটন গাড়িতে যা চৌরঙ্গীর ইউরোপীয়দের বাসস্থানের নিকটে ব্যবহৃত হয়। ঐসব গাড়ির চাকা রবার-মোড়া বলে শব্দ হত না।...

ভগিনীর আগমনে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। দেখি যে তিনি দারোয়ানকে গাড়ি থেকে একটা লম্বা প্যাকেট নামাতে বললেন। খবর পেয়ে ম্যানেজার শশব্যস্ত হয়ে এলেন।... তাঁকে বাড়ির মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আনা হল। তিনি একজনকে বললেন, পরিচালক-স্বামীজী যদি অসুবিধা বোধ না করেন একবার যেন আসেন। তিনি এলে ভগিনী হাঁটু গেড়ে নত মস্তকে প্রণাম করলেন।...

ভগিনী ম্যানেজার মহাশয়কে আগেই একটি বড় পেরেক ও হাতুড়ি আনতে বলেছিলেন। দারোয়ান সেগুলি আনলে স্বামীজীকে দেওয়ালে পেরেক পুঁতবার অনুমতি চাইলেন। তারপর দারোয়ানকে বললেন, প্যাকেটটি খুলতে। প্যাকেট খুললে দেখা গেল, সেটি ভারতবর্ষের একটি বিরাট মানচিত্র, দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট, প্রস্থে পাঁচ ফুট। খোলামাত্র ভিতর থেকে ক্যাশমেমো পড়ল...দাম পঁচিশ টাকা, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং ইত্যাদি। উপরে নীচে রোলার দেওয়া, পিছনে কাপড়-লাগানো। বুঝলাম, কেন তিনি ফার্স্টক্লাস ফিটনে এসেছেন। মানচিত্রটি দেওয়ালে টাঙানো হল।

''ভগিনী স্বামীজী মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'...Swamiji, with your kind permission, I wish to address a few words to these boys.... 'My dear boys, you have all read geography in your school days. What you have read, heard, or seen was only about the physical features of India's mountains, hills, rivers, lakes, deserts etc. The map which you see now hung on the wall before you, is not merely a vast sheet of paper in print, but this is the picture of your Mother. From Kashmir to Kumarika is a living and throbbing entity. The mountains, the hills are Mother's bones, the rivers and streams are her arteries, and veins. The vacant spaces you see are not

mere heaps of clay, mud or sand but her flesh. The trees, plants are her hairs.

...''তোমরা অবকাশ পেলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবে—ভ্রমণের দ্বারা মাতৃভূমির স্বরূপ বুঝতে পারবে।... তোমরা যেমন আজ তোমাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে চলেছ, তাঁদের নির্দেশিত পথ আজ যেমন তোমাদের উপকৃত করছে, ঠিক তেমনি তোমাদের উত্তরসূরীরা যেন তোমাদের পথে চলতে পারে, এইভাবে নিজেদের গড়ে তুলবে।

'উত্তরকালে তোমরা শিক্ষা বা বাণিজ্যের জন্য কিংবা দেশভ্রমণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাবে। কিন্তু একটা কথা সবসময় স্মরণ রাখবে—যে-দেশেই যাও, ভারতমাতার মূর্তি যেন তোমাদের মনে মলিন না হয়। তিনি যেন তোমাদের হৃদয়কেন্দ্রে বিরাজ করেন।'

''ভাবাবেগে ভগিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি নির্নিমেষ নয়নে কিছুকাল ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। আমরা বিভোর হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। ভগিনীর কথায় আমাদের সংবিৎ ফিরল। তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে এবার কিছুকালের জন্য বাহ্যদৃষ্টি বন্ধ করো; মানসচক্ষে ভারতমাতার চরণ দর্শন করো; প্রণতি জানাও সেখানে। আর আমার সঙ্গে একবার কণ্ঠ মিলিয়ে বলো—বন্দে মাতরম্।'

''আমাদের সমবেত উদাত্ত ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্' ছাত্রাবাসের প্রাকারে প্রতিধ্বনি তুলল—বন্দেমাতরম্।''[৬]

নিবেদিতা শরীরচর্চা এবং অস্ত্রব্যবহারেও যুবকদের প্ররোচিত করেছেন। নাগপুরের মরিস কলেজে ক্রিকেটারদের পুরস্কার দিতে উপস্থিত হয়ে তিনি ছাত্রদের তিরস্কার করেন স্বদেশি খেলাকে অবহেলা করার জন্য। এমনকী তিনি পরদিন তরবারি খেলা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি সামরিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে চান। কোনও কোনও ছাত্র এবং কিছু বহিরাগতকে এনে কোনওমতে পরদিন সে-ব্যবস্থা করা হল। যারা আখড়ায় গিয়ে তরবারি চালানো, লাঠিখেলা, মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি শারীরিক কৌশল অভ্যাস করত, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা তাদের অবজ্ঞা করেন জেনে নিবেদিতা বললেন, স্নাতকরা দেহে-মনে দুর্বল, বিপদে আত্মরক্ষা করতে পারে না, মা-বোনের মর্যাদা রাখতে পারে না। এদের দিয়ে সমাজের কী উপকার হবে? দেশের এখন প্রয়োজন বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের—যারা বিদেশি সরকারের দাসত্বও করবে না, স্বদেশীয়দের অত্যাচারও করবে না। তারাই দেশকে উন্নত করবে।[৭]

প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার বাস্তব উপায় তিনি নির্দেশ করেছেন। যুবকদের উদ্দেশে বলেছেন : ''আমি চাই, তোমরা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করো, বক্সিং করো, তরবারি খেলো। শান্তশিষ্ট গোবেচারা লোক চাই না—চাই শক্তিধর মানুষ।'' স্বামীজী আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী, হৃদয়বান, সাহসী যুবকদের আহ্বান করেছিলেন তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য। আর নিবেদিতার দাবি—কেবল বলিষ্ঠ হওয়াই যথেষ্ট নয়, বীর হতে হবে। ''সেই হল বীর, যে লড়াই করে, লড়তে ভালবাসে।... লড়াই করো, লড়াই করো, কেবল লড়াই করো। কিন্তু তাতে নীচতা বা তিক্ততা যেন না থাকে।... যখন সংগ্রামের ডাক আসবে, যেন ঘুমিয়ে থেকো না।''[৮]

নিবেদিতার জাতীয় আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তা সর্বাত্মক দেশাত্মবোধের উদ্বোধনী সাধনা। দেশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনাসম্পন্ন ভারতবর্ষ গঠনের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন স্বামীজীর কাছ থেকে। এই দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি প্রেরণাদাত্রী। ভারতবর্ষের কল্যাণে নিজের অসামান্য প্রতিভার জীবনকে

উৎসর্গ করেছেন।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ১৯০৩ এর গ্রীষ্মকালে ভগিনী মেদিনীপুর গিয়েছিলেন। গাড়ি স্টেশনে পৌঁছলে উপস্থিত সমিতির সদস্যরা এবং ভদ্রলোকেরা হিপ হিপ হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। নিবেদিতা আঁতকে উঠে হাত নেড়ে ইশারায় চুপ করতে বললেন। অবাক জনতাকে বুঝিয়ে বললেন—ওটি ইংরেজদের উল্লাসধ্বনি;ভারতবাসীর উল্লাসধ্বনি হওয়া উচিত নয়। তখনও 'বন্দেমাতরম্' ব্যবহৃত হয়নি। যখন শুনলেন, তেমন কোনও ধ্বনিসূচক শব্দ নেই—তখন নিজে তিনি হাত তুলে জোরে জোরে তিনবার বললেন—ওয়া গুরুজী কি ফতে; বোল্ বাবুজী কি খাল্সা।... তখন মেদিনীপুরে ভীষণ গ্রীষ্ম। যে-ঘরটিতে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, বেলা একটার সময় তাতে ঢুকে সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিলেন। খাটের উপর থেকে পরিষ্কার গদিটি সরিয়ে দিয়ে নিজের ছোট্ট মাদুর ও পাতলা কাঁথাখানি পাতলেন। কেউ অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন—সংযম অভ্যাস করছেন আর আমরা যে কাজে ব্রতী তাতে এধরনের সংযম অভ্যাস করা উচিত।... পাঁচদিন ছিলেন মেদিনীপুরে—প্রতি সন্ধ্যায় ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন। সকালে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রথমদিনের বক্তৃতার পর একজন তাঁকে জানান—আপনার বক্তৃতায় রাজনীতির তীব্রতা বেশি ছিল বলে অনেকে চলে গেছেন। পরের বক্তৃতায় হয়তো লোক হবে না। নিবেদিতার উত্তর : ''আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনো প্রবাহিত। যারা ভয় পায়, আমার বক্তৃতা তাদের জন্য নয়।" সত্যি সত্যি পরের বক্তৃতায় ভাল লোক হয়নি কিন্তু তিনি সমান আগ্রহে পাঁচদিন বক্তৃতা করেন। নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি ঘুরিয়ে ও অন্যান্য কসরত করে যুবকদের অনুপ্রাণিত করেন। ভগিনীর আগমন, হেমচন্দ্রের ভাষায়, ''আমাদের মরাগাঙ্গে আবার বান ডাকিয়ে দিল।"[৯]

নিবেদিতার আশা ছিল, ''জাতীয়তার ধারণা হয়ে উঠবে ভারতের খড়্গ।" ১৯০৩ এর ২৫ আগস্ট লিখলেন : ''আমার লাঙলের ফলা ভারতের উপর দিয়ে কেটে এগিয়ে যাক—গভীরে, আরো গভীরে—চলার সময়ে ঢুকে যাক একেবারে কেন্দ্রে।" বললেন, ''আমার জীবনোদ্দেশ্য—মনুষ্য নির্মাণ নয়—জাতি নির্মাণ।"[১০]

তাঁর রচনাবলির প্রতিটি ছত্রে ভারতীয় মনকে গ্রহণ ও ধারণ করার কী অপূর্ব ক্ষমতা ব্যক্ত হয়েছে! ভারতের প্রতি প্রেম তাঁকে দিয়েছিল ভারত-বিষয়ে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি । এই অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিমানসের কল্পনা ও অনুভূতির উদার বিস্তার।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০২—বোম্বাই শহরের গেটি থিয়েটারের বক্তৃতায় ভারতের যুবক ও ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করে বললেন—ভারতের যুবক এবং ছাত্রদের কাছে ভারতীয় স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মচর্য পালন অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই। এর সাহায্যেই যে কেউ অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে এবং জাগতিক মোহ দূর করে পরব্রহ্মে লীন হতে পারে। ২ অক্টোবর হিন্দু লেডিজ স্যোশাল ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত বক্তৃতায় তিনি বললেন :

''আমি ভারতকে ভালবাসি, কারণ জগতের ধর্মমতগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভারত তার জন্মদাত্রী।...

''হে ভগ্নীগণ, আপনাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা আছে, কারণ আপনারা এই প্রিয় ভারতভূমির কন্যা। আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে এই মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন করুন।

আপনাদের সাহিত্যই আপনাদের উন্নত করবে। আপনাদের পারিবারিক জীবনের যে সরলতা ও গাম্ভীর্য, তা যেন অটুট থাকে। প্রাচীনকালে এই পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা ছিল, এবং যা এখনও আপনাদের ঘরে রয়েছে, সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

''পাশ্চাত্যের আধুনিক রীতিনীতি ও আড়ম্বর এবং তার ইংরেজী শিক্ষা যেন আপনাদের বিনম্র সৌজন্য নষ্ট না করে।... আমার এই অনুরোধ কেবল হিন্দু ভগ্নীগণের কাছে নয়, মুসলমান ভগ্নীগণকেও আমার এই অনুরোধ, আপনারা সকলেই আমার ভগ্নী, কারণ যে দেশকে আমি স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছি, এবং যেখানে আমি আমার গুরুদেব বিবেকানন্দের অভিপ্রেত কাজ করে যেতে আশা করি, আপনারা সকলেই সেই দেশের কন্যা।''[১১]

ভারতীয় নারীদের প্রতি নিবেদিতা তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন মাদ্রাজের মহিলাদের উদ্দেশে 'খোলা চিঠি' নামে একটি বিবৃতিতে। ''স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের পুরুষের চেয়ে নারীর উপর বেশি নির্ভর করছে। আর আমাদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।... সকল দেশেই জাতি তার পবিত্রতা ও শক্তি, এই দুই সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করে এসেছে, পুরুষের উপর নয়। মুষ্টিমেয় পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন...। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন; তাঁদের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি এবং মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত।... অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মত নীরব, শান্ত জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন! বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐসকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।

''আজ আমাদের দেশ এবং ধর্ম দারুণ দুর্দশায় এসে পড়েছে। ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহ্বান করছেন—তাঁরা যেন প্রাচীন কালের মত শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন।... প্রথমতঃ, হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। এছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্যলাভ সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান্ আদর্শ নেই;... ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

''দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদ্-গ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি—জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন ও শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নন? আবার কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করব না?...''[১২]

নিবেদিতা যখন বন্ধুদের সঙ্গে বসে গীতা বা উপনিষদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেছেন, তখন তাঁর পাশ্চাত্য কণ্ঠে প্রাচ্যসুরের ঝংকার, উৎসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল, অন্তরের গভীর আবেগ শ্রোতাদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে—কিছু না বুঝেও তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থেকেছেন। তাঁর নিজের মধ্যে যে-শক্তি ও উৎসাহ ছিল তা অন্যের মধ্যে সঞ্চার করেছেন। তাঁর নির্ভীক, দৃঢ় উৎসাহপূর্ণ কথায় হতাশভাব ও অবসন্নতা দূর হয়ে

যেত। ১০ জুন, ১৯০৯ ড. জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগ্নে অরবিন্দমোহন বসুকে (বি. এস. সি পাশের পরে) লেখা চিঠির ভাষায় যে কী যজ্ঞাগ্নি জ্বলেছে তা পড়লেই বোঝা যায়। ''অনন্ত ধৈর্যময় আত্মোৎসর্গ ঘটুক তোমার জীবনে। সত্যের জন্য, কর্তব্যের জন্য, ভালবাসার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো—ত্যাগ করো, ত্যাগ করো, শান্তি না রেখে, শ্রান্তি না রেখে, শর্ত না রেখে, সীমা না রেখে; অর্জন করো সেই শক্তি ও ভক্তি যা বলে—নাও! নাও! কদাপি স্বপ্নেও বলে না—দাও! দাও! দাও!

''তারপর, তোমার জন্য প্রার্থনা আমার—অনন্ত জ্ঞানের শক্তি হোক তোমার, আরও জানার তৃষ্ণায় অধীর হও, অধীর হও; যেটুকু সত্য পেয়েছ, কদাপি সন্তুষ্ট হয়ো না তাতে, আদর্শের অভিমুখে চড়াই ভেঙে ওঠো নিরন্তর, অক্লান্ত আবেগে, (কখনো আদর্শের ফল-পরিণতি—যশ, সৌন্দর্য, সুখ, সম্পদের জন্য লোলুপ হয়ো না।) আ-হাঃ অরবিন্দ, তোমার জন্য আমি সেই আদর্শই চাই, যা ডুবিয়ে দেয়, মেরে ফেলে, যা কখনো তৃপ্তি দেয় না, শান্তি দেয় না, যা কদাপি করায়ত্ত হয় না।

আর চাই, সাক্ষাৎ কর্তব্যের মধ্যে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে; ভবিষ্যৎ কি করবে না করবে, তা নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে দরকষাকষি করো না। মনের এই প্রবৃত্তি দূর করা সত্যই বড় কঠিন। কিন্তু যাকে আদর্শলাভ করতে হবে, তাকে জানতে হবেই, কিভাবে আনুগত্যের প্রবাহে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়...।

''আশা করি, তুমি কখনো, কখনই, সহজকে, স্বচ্ছন্দকে বাছবে না, নিজের উপর কঠোর হবে, এমন উচ্চমানের জন্য লড়াই করবে, যা অন্যের প্রত্যাশার অতীত।''[১৩]

বিপ্লব আন্দোলনের মডারেট নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে যে-উদ্দীপক কথাগুলি নিবেদিতা লিখেছেন তা উচ্চাঙ্গের বীররসের সাহিত্য বলে মনে হয় : ''আমাদের চতুর্দিকে ক্রমজাগ্রত জীবন ও সংগ্রামের মহোৎসব। যদি কেউ বিভ্রান্ত বা বিষণ্ণ হয়, তার কারণ, যে-কাজে অগ্নি শিখায় শিখায় লক্‌লকিয়ে ওঠে, সেই যথার্থ কাজের ধারা সে গ্রহণ করতে পারেনি। আর যদি কেউ তা পেয়ে যায়, তার কি দীর্ঘশ্বাসের সময় থাকে?... পুরুষের পৌরুষ, নারীর নারীত্ব—নিজের কর্মপথ নিজেই দেখে নেবে। মুক্ত করে দাও জীবনকে। বরণ করে নাও জীবনের পূর্ণ দানকে। সর্বোচ্চ মানবিক আবেগ এবং ত্যাগের দিব্য প্রেরণায় পূর্ণ একটি মহাজাতির প্রাণচেতনা—তার সম্বন্ধে তোমার আমার ভাবনাকে বদ্ধঘরে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবে।

''যে-আনন্দে পূর্ণ আমি, যদি তাকে ইচ্ছামতো তোমাকে দিতে পারতাম। আমি ভালবাসি দুঃখকে—সংগ্রামকে—দিব্য আত্মবলিদানকে। তার অধিকার আমাদের হোক।''[১৪]

সৌজন্যবোধ ও নিয়মনিষ্ঠার এতটুকু ত্রুটি সহ্য করতে পারতেন না নিবেদিতা। অধ্যাপক গোকুলদাস দে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। একদিন তিনি তাঁর দাদার সঙ্গে উদ্বোধনবাড়িতে শ্রীমায়ের কাছে গিয়েছেন। নিবেদিতাও গিয়েছিলেন। শ্রীমাকে দর্শন, প্রণাম করার পর নিবেদিতা গোকুলবাবুর দাদার সঙ্গে বাড়ির প্রবেশপথের দুইপাশে বারান্দার সিঁড়ির উপর বসে গভীরভাবে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের খেয়াল ছিল না যে উদ্বোধনবাড়িতে যেতে হলে কাউকে তাঁদের দুজনের মাঝখান দিয়েই যেতে হবে। গোকুলবাবুকে বাড়ির বাইরে এসে আবার ফেলে আসা ছাতাটি আনতে বাড়ির মধ্যে যেতে হয়েছিল। এভাবে তাঁকে দু-তিনবার যাতায়াত করতে হয়। তাঁর এই আচরণে নিবেদিতা যারপরনাই বিরক্ত হলেন এবং গোকুলবাবুর অশিষ্টতা সম্বন্ধে তাঁর দাদাকে ও পরে কথামৃতকার মাস্টারমশাই-এর কাছে নানা মন্তব্য করলেন। মাস্টারমশাই পরে গোকুলবাবুকে বুঝিয়ে

বলেন—আচরণে এতটুকু বেচাল দেখলে নিবেদিতা সহ্য করতে পারেন না—প্রত্যেকবার যাতায়াতের সময় তাঁর 'Excuse me Madam' বলা উচিত ছিল। ভারতবর্ষের ছেলেদের সৌজন্যবোধের অভাব কেন থাকবে?

ভারতের আদর্শই নিবেদিতার আদর্শ—ভারতের স্বপ্ন নিবেদিতার স্বপ্ন—ভারতের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তিনি এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন—সবসময়ই চেয়েছেন স্বামীজীর ভারতবর্ষের ছেলেরা—ঋষিদের বংশধরেরা—ভারতের ঐতিহ্য, রীতিনীতি মেনে চলবে, তাদের আচার-আচরণও হবে ঋষিদের মতো। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''নিবেদিতা তাঁর প্রতিটি কার্য, প্রতিটি চিন্তা, জীবনের প্রত্যেক আবেগের অন্তর্বর্তী করে নিয়েছিলেন ভারতের আশা ও আদর্শকে...। মনে হত যেন প্রাচীনকালের কোনো ঋষির মুক্ত আত্মা এঁর [পাশ্চাত্য] দেহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে, যার ফল : পাশ্চাত্য জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইনি পুরাতন ভালবাসার চেনা জায়গাটিতে ফিরে এসে এখানকার জনগণের সেবা করতে পারেন।"[১৫]

নন্দলাল বসু ও সুরেন গাঙ্গুলি একবার বোসপাড়া লেনের বাড়িটিতে এসেছেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে। ওঁরা তাঁর দোতলার বসার ঘরে সোফাতে বসেছেন। মেঝেতে কার্পেট পাতা। ঘরে ঢুকে নিবেদিতা বললেন, ''তোমরা আসন করে বস, আমি দেখি।" মেমসাহেব অপমান করলেন ভেবে তাঁদের খুব রাগ হল। তাঁদের মনের ভাব বুঝে তখনই তিনি বললেন, ''তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভাল লাগে না। তোমরা এই যেভাবে বসেছ ঠিক বুদ্ধের মত। ভারী ভাল লাগছে আমার দেখতে।" আনন্দে আপ্লুত মুখে তাঁদের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন—কী দেখলেন তিনিই জানেন![১৬]

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় জীবনে যা-কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ তাদেরই বিচ্ছুরিত চেতনার জগতে নিবেদিতা দিন কাটিয়েছেন। প্রতিদিন দলে দলে যুবক ছাত্র ও অধ্যাপক তাঁর কাছে এসেছেন। ভাবের সঙ্গে যখন তিনি ভারতের মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন, ধর্মসম্বন্ধে স্বামীজীর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর গভীর দেশপ্রেম বর্ণনা করেছেন, তখন শ্রোতারা অভিভূত হয়ে শুনেছেন। সিংহীর মতো তেজোদৃপ্তকণ্ঠে যখন দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের জন্য সকলকে জীবনপণ করতে আহ্বান করতেন, তাঁদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণার আগুন জ্বলে উঠত।

স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবাসী মানুষ হোক, স্বাধীনতালাভের যোগ্য হয়ে উঠুক। দিবারাত্রি প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন—মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। নিবেদিতার বক্তৃতাগুলিতে স্বামীজীর আদর্শের পূর্ণপ্রকাশ। জাতীয়তাবোধ, ভারতের ঐক্য, ব্রহ্মচর্য পালনের আবশ্যকতা, ধর্মের সংরক্ষণ, সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রতিটি সুচিন্তিত বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে ভারত-জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, অকপট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। স্বামীজী দেশের যুবকদের আহ্বান করে বলেছিলেন, ''আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন—অন্যান্য দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই।"[১৭] দেশকে জাগানোর কাজ স্বামীজী আরম্ভ করে গেছেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ ভাষণে দেশে যে-গভীর উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে, তাকে উদ্দীপিত রাখার দায়িত্ব নিবেদিতা নিজেই অনুভব করেছেন। স্বামীজী বলেছিলেন, ''সমগ্র ভারত তার ভাবে মুখর হয়ে উঠবে।"[১৮] (India shall ring with her.)

নিরভিমান হৃদয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছেন নিবেদিতা—কবে ভারতবাসী দেশের কাজে এগিয়ে

আসবে। তাঁর জোর ছিল না কারও উপর, আশাও করেননি কোনও কিছুর। চোখে ফুটে উঠেছে নীরব মিনতি—হাতে চলেছে কাজ। যেন নীরব ভাষায় বলে চলেছেন, ''কী করেছ তোমরা ভারতের জন্য? আমাদের পাশে এসে কি দাঁড়াবে না?'' ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত পত্র : পত্রসংখ্যা ২৮৮, ৩৭১, ৩৫৭, ৫১০

২। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল : কলকাতা, ১৯৮৫)

তথ্যসূত্র

১। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, *অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০৮), পৃঃ ১২৬

২। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ৩১৬ [এরপর *ভগিনী নিবেদিতা*]

৩। তদেব, পৃঃ ৩৩০

৪। দ্রঃ *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, পরিচ্ছদ : ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া

৫। *ভগিনী নিবেদিতা*, পৃঃ ৪০৭-০৮

৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৯৪), খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৫-৪০

৭। দ্রঃ তদেব, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩২-৩৩

৮। তদেব, পৃঃ ১৩৩

৯। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৯০-১৯১

১০। তদেব, পৃঃ ১৫৯

১১। *ভগিনী নিবেদিতা*, পৃঃ ২৩১

১২। তদেব, পৃঃ ২৩৮-৩৯

১৩। *নিবেদিতা লোকমাতা* খণ্ড ১, পর্ব ২ (১৩৯৮), পৃঃ ২৬৪-৬৫

১৪। *নিবেদিতা লোকমাতা*, খণ্ড ২, পৃঃ ২৫৩

১৫। তদেব, পৃঃ ৫

১৬। দ্রঃ *ভগিনী নিবেদিতা*, পৃঃ ৪০৭

১৭। তদেব, পৃঃ ২৪২

১৮। তদেব, পৃঃ ২৪৩

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে
শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

* The Divine Legacy (ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা, পৃঃ ৩১৬, মূল্য : ২০০ টাকা)

* *Sister Nivedita in Contemporary Newspapers* (পাশ্চাত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং তাঁর বক্তৃতাবলির সংকলন আলোচনা সহ, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, পৃঃ ২৫৬, মূল্য : ৩০০ টাকা)